بسم الله الرحمن الرحيم

জুমুআর খুতবা (৩০ নভেম্বর ২০১২)

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)

বাংলা ডেস্ক নিজ দায়িত্বে খুতবার এই বঙ্গানুবাদ উপস্থাপন করছে।

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ৩০ নভেম্বর ২০১২-এর (৩০ নবুয়ত, ১৩৯১ হিজরী শামসি) জুমুআর খুতবা।

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِك يَوْمِ الدِّين * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاط الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوب عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ (آمين)

এখন আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সম্মানিত সাহাবীদের বিভিন্ন রেওয়ায়েত বা ঘটনাবলী উপস্থাপন করব যাতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি সাহাবীগণের পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও এতদসংক্রান্ত ঘটনাবলী থাকবে। এছাড়া সাহাবীদের উপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বইয়ের প্রভাব এবং সেগুলো পড়ে তাদের অন্তরে সত্যের যে প্রতিফলন ঘটেছে সে সম্পর্কেও দু'একটি ঘটনা থাকবে। অনুরূপভাবে আল্লাহ্ কীভাবে স্বপ্নের মাধ্যমে সত্য দেখিয়েছেন তারও উল্লেখ থাকবে। ঘটনাগুলোর বর্ণনা দীর্ঘ হওয়ার কারণে আমি দু'একটি ঘটনাই নিয়েছি।

হযরত শেখ জয়নুল আবেদীন সাহেব (রা.) বলেন, একবার আমার এক ভাবী অসুস্থ হয়ে পড়েন আর রোগ ছিল ভয়াবহ। আমরা চিন্তা করলাম, এখন কাদিয়ান যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই। তাই সেখানেই নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। হযরত খলীফা আউয়ালের মত বড় কবিরাজ সেখানে রয়েছেন, তাঁর মাধ্যমে চিকিৎসা করাব অথবা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সমীপে দোয়ার আবেদন করব। তিনি লিখেন, আমরা রওয়ানা হলাম, আমার মা এবং ভাইও সাথে ছিলেন। [হুযূর বলেন, হাতের লেখা তাই ঠিকমত পড়া যাচ্ছে না] যাহোক, তিনি লিখেছেন, মেয়েকে অর্থাৎ সেই অসুস্থ মহিলাকে বলা হলো, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলবেন, মৌলভী নূর উদ্দীন সাহেবের চিকিৎসা নাও। কিন্তু তুমি বলবে, আমি হুযূরের চিকিৎসাই করাতে চাই। মৌলভী সাহেবের চিকিৎসা আমি কোনক্রমেই নেবো না। তিনি লিখেন, আমরা কাদিয়ানে পৌঁছার পর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বললেন, মৌলভী সাহেব আপনার চিকিৎসা করবেন। কিন্তু সেই মেয়ে বলল, আমি তো মৌলভী সাহেব দ্বারা চিকিৎসা করতে প্রস্তুত নই, হুযূর আপনি নিজেই আমার চিকিৎসা করুন। হুযূর (আ.) একটি ঔষধ লিখে দিলেন এবং বাড়ির ভেতর থেকে তিন বোতল মধু এনে দিয়ে বললেন, আগামীকাল আমি লুধিয়ানা যাচ্ছি, আপনি ঔষধ সেবন আরম্ভ করুন, রোগ ভয়ানক। আমাকে পত্রযোগে জানাবেন অথবা স্বয়ং চলে আসবেন। তিনি লিখেন, সেই ব্যবস্থাপত্র নিয়ে আমরা হযরত মৌলভী নূর উদ্দীন সাহেবকে দেখালাম। তিনি এটি দেখে বললেন, এই ব্যবস্থাপত্র এ রোগের জন্য খুবই ক্ষতিকর। আমি যদি কোন রোগীকে এই ব্যবস্থাপত্র দেই তবে সে এক মিনিটেই মারা যাবে। কিন্তু এ ব্যবস্থাপত্র হুযূর (আ.) দিয়েছেন, কাজেই এ মেয়ে অবশ্যই আরোগ্য লাভ করবে। আমরা সেই ব্যবস্থাপত্র সেবন করালাম এবং দু'তিন দিনের মধ্যেই সেই মেয়েটি সুস্থ হয়ে উঠল।

হুযূর (আ.)-এর প্রতি হযরত মৌলানা নূর উদ্দীন সাহেবের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল; এ কারণেই হুযূর (আ.) বলেছেন, আমি যদি নূর উদ্দীনের মত মানুষ পাই তাহলে অচিরেই বিপ্লব এসে যাবে। কিন্তু সেই গ্রাম্য

লোকদেরও ঈমান ছিল যে, ব্যবস্থাপত্র যেমনই হোক আমরা তা সেবন করব এবং এতেই আরোগ্য লাভ হবে। আর আল্লাহ্ তা'লা আরোগ্য দিয়েছেন।

হযরত মিয়াঁ মোহাম্মদ শরীফ কাশ্মীরি (রা.) বলেন, মৌলভী ইমাম উদ্দীন সিখওয়ানীর ভাই মিয়াঁ জামাল উদ্দীন সিখওয়ায়নী হুযূর (আ.)-এর সমীপে নিবেদন করেন, (তখন হুযূর উপরে অর্থাৎ মসজিদে অবস্থান করছিলেন) ইনি আমার ভাই মোহাম্মদ শরীফ এবং তাদের এলাকায় প্লেগের প্রকোপ বড় ভয়াবহ, হুযূর তার জন্য দোয়া করুন, অর্থাৎ তিনি যে অঞ্চল থেকে এসেছিলেন সে অঞ্চলের কথা হচ্ছে। এ কথার প্রেক্ষিতে হুযূর (আ.) আমাকে সম্বোধন করে বলেন, প্লেগ কেমন হয়? আমি বললাম প্রথমে ইঁদুর মরে। হুযূর (আ.) বললেন, এটি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সতর্কবাণী। আমি বললাম, হুযূর, লাল রঙের ফোড়া বের হলে রোগী প্রাণে বেঁচে যায় এবং হলুদ হলে বাঁচে না। হুযূর (আ.) বললেন, আপনি কি সেখানে যাতায়াত করেন? উত্তরে আমি নিবেদন করলাম হুযূর যাতায়াত করা ঠিক হবে কি? হুযূর (আ.) বললেন, না যাওয়াই শ্রেয়। সচরাচর সেখানে যাবেন না কিন্তু যার ঈমান দৃঢ় তার কোন ভয় নেই, সে প্লেগে মরবে না। আমি বললাম, আমার স্ত্রী প্লেগে মারা গেছে। হুযূর (আ.) বললেন, মনে হচ্ছে আমার প্রতি তার বিশ্বাস ছিল না। ঈমান থাকলে সে এই রোগে মারা যেত না। আমার মনে পড়েছে যে, সে বয়আত করে নি। হুযূর (আ.) বললেন, আপনি বেশি বেশি ইস্তেগফার করুন। আমাদের পরিবারের সবাই অসুস্থ ছিল, আমি হুযূর (আ.)-এর সমীপে লিখলাম, উত্তরে হুযূর (আ.) বললেন, ইস্তেগফার করতে থাকুন। আমরা ইস্তেগফারে রত হয়ে গেলাম। আর আল্লাহ্‌র কৃপায় আমরা সবাই সুস্থ হয়ে উঠলাম।

মিয়াঁ মোহাম্মদ শরীফ কাশ্মিরী সাহেব (রা.) আরো বলেন, মিয়াঁ সিদ্দিক সাহেবের ছেলে জামাল উদ্দীন সিখওয়ায়নী আমাকে বলেছেন, আমরা চিন্তা করলাম, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি ইলহাম হয়েছে **'রাজা-বাদশাহ্‌রা তোমার বস্ত্রে কল্যাণ অন্বেষণ করবে।'** তবে আমরা কী এ কল্যাণ থেকে বঞ্চিত থাকব? তখন তার চোখ থেকে পানি ঝরত। একবার তিনি হুযূর (আ.)-এর পাগড়ির আঁচল পেয়ে গেলেন এবং তা চোখের উপর বুলিয়ে নিলেন, এতে তার চোখ ভাল হয়ে গেল। তিনি বলেন, আমার চোখেও তখন প্রদাহ ছিল আর আমিও পাগড়ির আঁচল বুলিয়ে নেই ফলে তা নিরাময় হয়ে যায়।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুস্তকের প্রভাব সম্পর্কে একটি ঘটনা বরং দু'টি ঘটনা রয়েছে। মিয়াঁ নূর উদ্দীন সাহেবের ছেলে হযরত মিয়াঁ মুহাম্মদ দ্বীন সাহেব বলেন, এটি একটি চলমান ঘটনা, তিনি বলেন, আর্য, বাহ্মণ ও নাস্তিকদের বক্তৃতার বিষক্রিয়া আমাকে ও আমার মত আরো অধিকাংশ মানুষকে ধ্বংস করে দিয়েছিল। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা এবং ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল। আর এসব মন্দ প্রভাবের চক্রে জীবন অতিবাহিত করছিলাম, এমন সময় বারাহীনে আহমদীয়া পেয়ে যাই এবং পড়তে শুরু করি। এটিও আল্লাহ্ তা'লার একটি অনুগ্রহ, কেননা তিনিই বই পড়ার সৌভাগ্য দিয়েছেন। এমন অনেকেই আছে যাদের এ সৌভাগ্যও হয় না, আর তাদের প্রকৃতিতে গোঁয়ার্তুমি ও হঠকারিতা থেকে থাকে। যাহোক, আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ হওয়ার ছিল। তিনি বলেন, বারাহীনে আহমদীয়া পেয়ে পড়া শুরু করলাম, আর পড়তে পড়তে যখন ৯০ পৃষ্ঠার ২ নম্বর টিকা এবং ১৪৯ পৃষ্ঠার ১১ নম্বর টিকাতে পৌঁছে আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বের প্রমাণ পড়লাম তখনই আমার মধ্য হতে নাস্তিকতা দূর হয়ে গেল। (তিনি লিখেছেন, এটি রূহানী খাযায়েনের প্রথম খন্ডের ৭৮ পৃষ্ঠার ২ নম্বর টিকা। আমার মতে, এখানে ভুল হয়েছে, কেননা আগে সংখ্যা উর্দূতে লিখা হত। ২ নম্বর নয় বরং ৪ নম্বর টিকা হবে। একইভাবে রূহানী খাযায়েনের প্রথম খন্ডের ১৫৩ পৃষ্ঠার ১১ নম্বর টিকায় এ উদ্ধৃতি শুরু হয়ে চার-পাঁচ পৃষ্ঠা পর্যন্ত চলছে। এটি পড়লে আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়।) যাহোক, তিনি বলেন, সেখানে পৌঁছার সাথে সাথে আমার নাস্তিকতা দূর হয়ে গেল। কোন ঘুমন্ত বা মৃত মানুষ জেগে উঠলে যেমন হয় আমার চোখ সেভাবে খুলে যায়। তখন শীতকাল আর সেদিন ১৮৯৩ সালের জানুয়ারী মাসের ১৯ তারিখ। মধ্যরাতে বই পড়তে পড়তে আমি 'থাকা উচিত' আর 'আছে'-এ আলোচনার স্থলে পৌঁছলাম। {এখানে আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বের বর্ণনা হচ্ছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলছেন, যেসব জিনিসের অস্তিত্ব আছে সেগুলো দেখে হৃদয়ে এ চিন্তার উদ্রেগ হয় যে, এগুলোর কোন সৃষ্টিকর্তা থাকা উচিত এবং কোন সৃষ্টিকর্তা

আছে। এ দু'টি জিনিস হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বের প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। এটি আসলে এমন একটি জিনিস যা আল্লাহ্ তা'লার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাসের জন্ম দেয়। যাহোক, এটি অনেক গভীর একটি বিষয়। এ বিষয়ে এখন বিস্তারিত আলোচনায় যাওয়া যাচ্ছে না। বারাহীনে আহমদীয়াতে যা লিখা আছে তা পড়ে নিন।} তিনি বলেন, আমি যখন বই পড়ছিলাম তখন মধ্য রাত ছিল। পড়তে পড়তে 'থাকা উচিত' আর 'আছে'-এ স্থলে পৌঁছার পরই তওবার প্রতি গভীরভাবে মনোযোগ নিবদ্ধ হয় আর আমি তওবা করি। উঠানে পানি ভরা নতুন কলসী রাখা ছিল। অর্থাৎ ঠান্ডা পানির কলসী আঙ্গিনায় রাখা ছিল। জানুয়ারী মাসে কলসীর পানি কেমন ঠান্ডা হবে একটু ভেবে দেখুন! আমার কাছে তেপায়া একটি টুল ছিল এই ঠান্ডা পানি দিয়ে এতে আমি আমার লুঙ্গি ধৌত করলাম। মঙতু নামের আমার কাজের লোকটি ঘুমাচ্ছিল। লুঙ্গি ধোওয়ার সময় ওর ঘুম ভেঙ্গে যায় এবং সে আমাকে বলল, কী হয়েছে? কী হয়েছে? লুঙ্গিটি আমাকে দিন আমি ধুয়ে দেই। কিন্তু আমি তখন এমন সুরা পান করেছিলাম যার নেশা আমাকে কারো সাথে কথা বলার অনুমতি দিচ্ছিল না। সর্বাত্মক চেষ্টা করার পর শেষ পর্যন্ত মঙতু চুপ হয়ে গেল। তিনি বলেন, ভিজা লুঙ্গি পরেই আমি নামায পড়তে শুরু করলাম এবং মঙতু চেয়েচেয়ে দেখছিল। নিমগ্ন অবস্থায় আমার নামায এমন দীর্ঘ হল যে, কাজের লোক মঙতু ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল আর আমি নামাযে নিমগ্ন থাকলাম। বারাহীনে আহমদীয়া এ নামায পড়িয়েছে, আর এরপর থেকে আজ পর্যন্ত আমি নামায পরিত্যাগ করি নি। অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এই নিদর্শন বর্ণনার জন্য আমি উপরোক্ত কথাগুলো লিখেছি। অর্থাৎ বারাহীনে আহমদীয়া যে আমার মাঝে কীভাবে এক বিপ্লব আনয়ন করেছে তা বর্ণনার জন্যই এ সুদীর্ঘ ও সুন্দর অবতরণিকা। তিনি বলেন, যৌবনে যখন আমি খোদার সমালোচনা করতাম (অর্থাৎ যৌবনকালের কথা, যখন আমি অবিবাহিত ছিলাম) ঠিক সে সময় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ঈমান যা খুব সম্ভব সুরাইয়্যা নক্ষত্রে চলে গিয়েছিল তা নামিয়ে আমার হৃদয়ে প্রবিষ্ট করান। আর এভাবে 'মুসলমানকে মুসলমান বানানোর' ইলহামটি আমার সত্তায় সত্য প্রমাণিত হলো। বারাহীনে আহমদীয়া পড়ার কারণে যে রাতে আমি কাফির রূপে প্রবেশ করেছিলাম সেই রাতের প্রভাত হলো ইসলামের ছায়ায়। মুসলমান হিসেবে যখন প্রভাত হলো আমি আর সেই মুহাম্মদ দ্বীন থাকলাম না যে গতকাল সন্ধ্যায় ছিল। স্বভাবগত ভাবে আমার মাঝে লজ্জাবোধ গুণটি খুব ভাল ছিল। অর্থাৎ আমার চরিত্রে লজ্জাবোধ ছিল যা অসৎ সঙ্গের কারণে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ মন্দ লোকদের সাথে উঠাবসা করায় আমি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলাম। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর নিজ অনুগ্রহে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কল্যাণে লজ্জাবোধের সেই গুণ আমাকে পুনরায় ফিরিয়ে দিয়েছেন। আমি তখন সূরা হুজরাতের আয়াতগুলো উপভোগ করছিলাম। (এখানে আয়াত নম্বর লিখা হয়েছে ৭ কিন্তু হবে ৮ ও ৯ নম্বর আয়াত)

اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ﴿٨﴾ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٩﴾

অর্থাৎ, **'আল্লাহ্ ঈমানকে তোমাদের কাছে প্রিয় করে দিয়েছেন এবং তোমাদের অন্তরে তা আকর্ষণীয় করে তুলেছেন। আর কুফর, দুস্কৃতি ও অবাধ্যতা তোমাদের দৃষ্টিতে ঘৃণ্য করে তুলেছেন। (যাদের ক্ষেত্রে এ আয়াত প্রযোজ্য) তারাই সঠিক পথের অনুসারী। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এ এক বড় অনুগ্রহ ও নিয়ামত। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।'** (সূরা আল্ হুজুরাত: ৮-৯)

তিনি বলেন, ঈমান আনার সাথে সাথে কুরআনের মাহাত্ম্য ও ভালবাসা আমার অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে গেলো। অর্থাৎ শরীয়তের জ্ঞান যা ঈমানের মূল তা অর্জন করার স্পৃহা ও মনোবাঞ্ছা সৃষ্টি হলো। ১৮৯৩ -১৮৯৪ সালে আমি বারাহীনে আহমদীয়ার পাঠ একবার শেষ করলাম। আমি এ বইটি তাহাজ্জুদের নামাযের পরে পড়তাম। এরপর আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম পড়লাম যা তাওযিহে মারাম এরই ব্যাখ্যা। ১২তম অশ্বারোহী বাহিনীর অবসর প্রাপ্ত 'মুনশী' মির্যা জালাল উদ্দীন সাহেব যিনি গুজরাতের খারিয়াঁ তহসীলের বোলানীর অধিবাসী, দুই মাসের ছুটি নিয়ে শিয়ালকোট ক্যান্টনমেন্ট (ছাউনি) থেকে এসে বোলানীতে অবস্থান করছিলেন। সে সময় আমি বোলানীতে পাটওয়ারী ছিলাম। তাকে জিজ্ঞেস করে আমি বয়আতের চিঠি পাঠালাম যার উত্তর

আমি ১৮৯৪ সালের অক্টোবরে পাই। উত্তরে লেখা ছিল, সরাসরি হাতে বয়আতেরও প্রয়োজন আছে। ১৮৯৫ সালের ৫ই জুন মসজিদে মুবারকের ছাদের চিলেকোঠার দরজার চৌকাঠের পূর্ব দিকে বসে হযরত সাহেবের হাতে আমি এই বয়আত করি।

মিয়াঁ নূর উদ্দীন সাহেবের পুত্র হযরত মিয়াঁ মুহাম্মদ দীন সাহেব বলেন (আহমদী হবার পর) আমার মনে এ ধারণার উদ্রেক হয় যে, যেহেতু আমি ধর্মের জ্ঞান রাখি না, মৌলভীরা আমাকে অনেক বিরক্ত করবে। আমি কি করবো এ ব্যাপারে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বা অন্য কারো সাথে পরামর্শ করতেও লজ্জা পাচ্ছিলাম। কিছু জিজ্ঞেস করা ছাড়াই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করলেন। তিনি (আ.) মসজিদে মুবারকে মেহরাবের বাম পার্শ্বে শুয়ে ছিলেন। তাঁর মাথা উত্তর দিকে ছিলো। আমি তাঁর (আ.) পিঠের দিকে পূর্বমুখী হয়ে তাঁর শরীর টিপছিলাম। জিজ্ঞেস করতে লজ্জা হচ্ছিল কিন্তু আমি মনে মনে সে কথাই ভাবছিলাম। শায়িত অবস্থায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন **"আমাদের পুস্তক পাঠকারী কখনো পরাজিত হবে না।"** তা এত উচ্চস্বরে এবং প্রতাপান্বিত কণ্ঠে ছিল যে, আমি কেঁপে উঠলাম। (হুযুর ব্যাখ্যা করে বলেন) এ ধনভান্ডার তো আজও আমাদের কাছে আছে। আমাদের তা হস্তগত করার ও অধ্যয়নের চেষ্টা করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আজকাল বহুভাষায় এসব বই অনুদিত হয়ে ছাপা হয়েছে।

এখন আরেকটি ঘটনা বর্ণনা করছি। হযরত চৌধুরী ফাতাহ্ মুহাম্মদ সাহেব বর্ণনা করেন, আমার ভাই নবাব দ্বীন সাহেব স্বপ্নে দেখেন, হুযুর (আ.) আমার কাছ থেকে আট আনা চাইছেন। এরপর আমি ও নবাব দ্বীন সাহেব দু'জন পয়সা দিতে গেলাম এবং নিজেদের স্বপ্ন শুনালাম। হুযুর (আ.) বলেন, এ স্বপ্নের ফলে তোমরা জ্ঞান অর্জন করবে। এরপর মৌলভী সিকান্দর আলী সাহেব যখন আমাদের গ্রামে আসেন তখন আমি, নবাব দ্বীন এবং আরো অনেকে তার কাছ থেকে পবিত্র কুরআন এবং কিছু উর্দূ কিতাব পাঠ করি। এভাবে হযরত (আ.)-এর স্বপ্নের ব্যাখ্যা পূর্ণতা লাভ করে। তিনি আরো বলেন, আমাদের গ্রামে একটি অশ্বত্থ গাছ ছিলো যা আমরা মির্যা নিযাম উদ্দীন সাহেবের কাছে বিক্রি করে দিয়েছিলাম। সে সময় আমাদের গ্রামে প্লেগের প্রকোপ ছিলো। হযরত সাহেব যখন ভ্রমনের উদ্দেশ্যে আমাদের এখানে আসেন তখন আমরা প্রাপ্ত অর্থ তোহফা হিসেবে হযরত (আ.) সাহেবের সমীপে উপস্থাপন করলাম। হযরত সাহেব রাস্তা থেকে কিছুটা সরে আমাদের গ্রামের মসজিদের কাছে আসেন এবং দোয়া করতে থাকেন আর এরফলে আমাদের গ্রামের প্লেগ দূরীভূত হয়।

হযরত ফযল দ্বীন সাহেব (রা.) তার বয়আতের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, আমি এক স্বাধীন চিন্তা-ধারার মানুষ ছিলাম। জীবনের কিছুকাল এভাবেই কেটে যায়। পরবর্তীতে কয়েকজন বন্ধুর সাহচর্যে নকশ্বন্দী তরীকার মুরীদ হয়ে যাই। আমার বন্ধুরা নকশ্বন্দী তরীকার মুরীদ ছিল এবং আমাদের মুরশীদ অর্থাৎ পীর আমাদের গ্রামেই থাকতেন। এ পরিবার শরীয়তের বিধি-নিষেধ মেনে চলার এবং হযরত আবুবকর (রা.)-এর অধঃস্তন হওয়ার দাবী করতো। তাই বয়আতের সাথে সাথে আমাকে নামায পড়া এবং রোযা রাখার ব্যাপারে জোরালো তাগাদা দেয়। তাহাজ্জুদের ব্যাপারেও কঠোর আদেশ দেয়া হয় যে, তাহাজ্জুদের নামায কখনো ছাড়া যাবে না। আরো নির্দেশ দেয়া হয়, স্বপ্ন দেখলে তা কারো কাছে বলা যাবে না। সে যুগে আমি বেশ কয়েকটি স্বপ্ন দেখি। তবে তা কারো কাছে বলি নি। আমি রাজমিস্ত্রির কাজ করতাম। কাজ না পাওয়ার কারণে আমার পীরের অনুমতি নিয়ে সস্ত্রীক অমৃতসর চলে আসি। সেখানে একটি ভাড়া বাসায় বসবাস করতে আরম্ভ করি এবং সেখানেই কাজ করতাম। একদিন তাহাজ্জুদ নামাযের পর দোয়া দরূদ পড়ছিলাম আর এমতাবস্থায় আমার ঘুম পায়। জায়নামাযে শুয়ে পড়ি। স্বপ্নে দেখলাম, আকাশ থেকে মানবরূপী ফিরিশ্তাদের একটি সেনাদল আমার চারপাশে কিছুটা দূরত্বে বৃত্তাকারে বসে যায় এবং একজন উচ্চপদস্থ সেনাকর্মকর্তা যিনি তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন, আমার পাশে এসে বসেন। তার বসার পর আকাশ থেকে একটি সোনালী সিংহাসন নেমে আসে এবং সেই সেনাদলের মাঝখানে সিংহাসনটি রাখা হল এবং সব সৈন্যরা সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যায়। আমি দেখলাম সেই সোনালী সিংহাসনে সমানভাবে জ্যোতির্মন্ডিত চেহারার দু'জন বুযূর্গ ব্যক্তি বসে আছেন, তাদের চারপাশে কেবল আলো আর আলো। তখন আমি আমার পাশের সেই অফিসারকে জিজ্ঞেস করলাম, এই বুযূর্গরা কারা? তিনি বলেন, ডান পাশে বসা বুযূর্গ হচ্ছেন, খোদার প্রিয় মুহাম্মদ (সা.) এবং যিনি বাম পাশে বসা

তিনি মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রিয় ইবনে মরিয়ম। আমি বললাম, ইবনে মরিয়ম তো হযরত ঈসা (আ.)-এর নাম যিনি ইসরাঈলী নবী ছিলেন। তিনি বললেন, ইনি সেই ব্যক্তি নন, তিনি তো মারা গেছেন। ইনি মুহাম্মদ (সা.)-এর সবচেয়ে প্রিয় ইবনে মরিয়ম। এরপর রসূল করীম (সা.) তাঁর পবিত্র মুখে ঐ অফিসারকে বললেন, উচ্চস্বরে লোকদেরকে জানিয়ে দাও যে, যখন ইবনে মরিয়ম আগমন করবে, তার অনুগত্য করা তাদের জন্য আবশ্যক হবে এবং যে তার আনুগত্য করবে না তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। ঐ সময় আমার স্ত্রী আমাকে জাগ্রত করে বলল যে, ফজরের আযান হয়ে গেছে। আপনি তাহাজ্জুদের পর কখনও ঘুমান নি, (আজ কি হয়েছে?) উঠুন আর নামাযের জন্য মসজিদে যান। আমি আমার স্ত্রীর প্রতি রাগান্বিত হলাম, কেন তুমি আমাকে জাগ্রত করলে?

পরদিন আমি গ্রামে চলে গেলাম এবং আমার স্বপ্ন সবিস্তারে আমার পীরকে শুনালাম। তিনি বললেন, তুমি সৌভাগ্যবান যে, স্বপ্নে মহানবী (সা.)-এর দর্শন লাভ করেছ। এরপর বলেন, শীঘ্রই ইবনে মরিয়ম অবতরণ করবেন আর তখন আমরা ভিনদেশে থাকব। অর্থাৎ, তিনি স্বপ্নের তা'বীর করেন, আমরা ভিনদেশে থাকব এবং শীঘ্রই ইবনে মরিয়ম আবির্ভূত হবেন। এ যুগ প্রতিশ্রুত মসীহ্‌রই যুগ। তারাই সৌভাগ্যবান যারা এটি পাবে। পীর এ জবাব দিলেন। তিনি বলেন, এরপর আমি সেচ ও নহর বিভাগে মিস্ত্রি হিসেবে চাকরী করি। এক বাবুর মাধ্যমে অর্থাৎ এক কেরানীর মাধ্যমে এ চাকরীটি পাই এবং চাকরীরত অবস্থায় আমি অনেক স্বপ্ন দেখি। নিষেধাজ্ঞার কারণে (অর্থাৎ, ঐ পীর ও মুর্শিদ কাউকে স্বপ্ন বলতে নিষেধ করেছিলেন) আমি কারো কাছে আমার স্বপ্ন প্রকাশ করি নি। আমি পনের বিশ বছর চাকরী করি। এরপর চাকরী ছেড়ে গ্রামে ফিরে যাই এবং নিজ বাড়ীতে বসবাস আরম্ভ করি। আমার এক ভাই মৌলভী মোহাম্মদ চেরাগ সাহেব যিনি আমাদের শিক্ষকও এবং কট্টর আহলে হাদীস ছিলেন, আমি যখন চাকরী ছেড়ে ফেরত আসি তখন তাকে আহমদী হিসেবে দেখতে পাই। তিনি আহমদীয়াত গ্রহণ করেছিলেন এবং আমার সাথে মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামাত সম্পর্কে আলোচনা আরম্ভ করেন। কিন্তু আমি কোন আগ্রহ দেখালাম না। কারণ, আমি পীর-ফকিরদের ধর্মে বিশ্বাসী ছিলাম এবং বিশ্বাস করতাম যে, ফকিররাই প্রকৃত শরীয়তের মালিক। এজন্য আমি মৌলভী সাহেবকে কোন জবাব দিলাম না এবং একথা বলে অবজ্ঞা করলাম যে, আজকাল এসব লোক ব্যবসা খুলে বসেছে এবং খোদার সৃষ্টিকে ধোকা দিচ্ছে। আমার পীরের মাধ্যমে যাচাই করব বলে মনস্ত করলাম, হযরত সাহেবের প্রত্যাদিষ্ট হবার এই দাবী সত্য নাকি ধোকা। যখন আমি তার বাড়ীতে গেলাম এবং পীর সাহেবের ছেলেকে জিজ্ঞেস করলাম হযরত সাহেব কোথায়, তখন সে কেঁদে জবাব দিল তিনি দু'মাস পূর্বে মৃত্যু বরণ করেছেন, আমরা আপনাকে তার মৃত্যু সংবাদ দিতে ভুলে গেছি, এজন্য ক্ষমা করবেন। তিনি বলেন, আমার খুব দুঃখ ও আক্ষেপ হল। আমি কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী ফিরে আসি। একদিন মৌলভী সাহেব পুনরায় আমাকে বলেন, তুমি শিক্ষিত মানুষ। হযরত সাহেবের রচনাবলী পড়ে দেখা উচিত। অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যে গ্রন্থাবলী রয়েছে, সেগুলো দেখা প্রয়োজন। তিনি তখনই 'জলসা মাযাহেব মহোৎসব' নামে একটি বই আমাকে পড়তে দিলেন। আমি পুরো বইটি পড়লাম। এরপর তিনি আমাকে বারাহীনে আহমদীয়ার প্রথম চার খন্ড পড়তে দিলেন। যখন আমি সম্পূর্ণ পড়ে শেষ করলাম সঙ্গে সঙ্গে আমার হৃদয়ে এ ধারণার উদয় হল যে, মুহাম্মদ (সা.)-এর পর এমন যোগ্য লোক আর হয় নি আর না-ই তাঁর (সা.)-পর ভিন-ধর্মাবলম্বীদের ইসলামের সত্যতার প্রতি আহবান জানাবার মত এরূপ কোন গ্রন্থ রচিত হয়েছে। তিনি বলেন, এরপর আমি দ্বিধা-দ্বন্দে পড়ে গেলাম। হৃদয়ে একথা উদিত হল, যে ব্যক্তি জগতের সামনে এমন জিনিস পেশ করেছে যদি সে সত্য হয়, যদি তাঁর হাতে বয়আত করি তাহলে আমি সত্যবাদীর বয়আত করব। আর যদি সে মিথ্যা দাবীদার হয়ে থাকে তবে একজন মিথ্যুকের বয়আতভূক্ত হবো। এ ধারণা হৃদয়ে এত দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হয় যে, দু'মাস পর্যন্ত এটি নিয়েই চিন্তিত ছিলাম। মৌলভী সাহেব আমাকে প্রতিদিন বুঝাতেন, কিন্তু মন সায় দিল না। একবার রমযান মাসের প্রথম দিন আমি খোদা তা'লার কাছে খুব অনুনয়-বিনয় ও কান্নাকাটি করে দোয়া করলাম, হে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা! মুহাম্মদ (সা.)-এর দোহাই, যদি এ ব্যক্তি অর্থাৎ মির্যা সাহেব সত্য হয়ে থাকেন এবং তুমিই তাঁকে জগতের সংশোধনের জন্য প্রত্যাদিষ্ট করে অবির্ভূত করে থাক, তবে তুমি তোমার সাত্তারী

বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে আমাকে প্রকাশ্যে বা স্বপ্নের মাধ্যমে কোন নিদর্শন দেখিয়ে দাও। যদি তুমি আমাকে কোন নিদর্শন না দেখাও তবে, কিয়ামত দিবসে আমার বিরুদ্ধে তোমার কোন কিছু বলার অধিকার থাকবে না। কেননা, সত্য ও মিথ্যার মাঝে পার্থক্য করার সামর্থ্য আমার নেই। রমযানের পনের দিন অতিবাহিত হয়, তাহাজ্জুদের পর জায়নামাযেই ঘুমিয়ে পড়ি। তখন স্বপ্নে দেখলাম, আমি এবং আমার সাথে অন্য এক ব্যক্তি কোন এক শহরে গিয়েছি। রাস্তায় আমরা এক বাগান দেখলাম যার চর্তুদিকে প্রায় ৩ ফুট উঁচু প্রাচীর ছিল। (বাগানের চারদিকে তিন ফুট উঁচু দেয়াল ছিল)। ঐ দেয়ালের পাশে গিয়ে দেখলাম, বাগানটি যেন একটি বেহেশ্‌ত। আর নদী আছে ঠিকই কিন্তু পানি শুকিয়ে গেছে, সামান্যই প্রবাহিত হচ্ছিল। তখন খুব জাকজমকপূর্ণ একটি মহল দৃষ্টিগোচর হয়। আমরা বাগানের ভেতরে গিয়ে দেখতে চাইলাম। এজন্য আমরা দু'জনই প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে ভেতরে যাওয়ার চেষ্টা করলাম। আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছি কিন্তু প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে ভেতরে যেতে পারি নি। তারপর আমরা দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হলাম, (তিনি তাঁর দীর্ঘ স্বপ্নের বিবরণ দিচ্ছিলেন) অবশ্যই ভেতরে যাব। এখন দেখি, এর দরজা কোথায়। আমরা বাগানের তিন দিকে ঘুরলাম। অর্থাৎ, আমরা দক্ষিণ, পশ্চিম এবং উত্তর এই তিন দিকের কোথাও দরজা খুঁজে পেলাম না। কিন্তু এরপর আমরা বললাম, চল, পূর্বদিকে যাই; সেখানে আমরা হয়তো কোন দরজা পেয়ে যাব। যখন আমরা পূর্ব দিকে রওনা হলাম, তখন একজন বুযূর্গকে গাছের ছায়ায় বসা দেখলাম। আর এই বুযূর্গ বা পুণ্যবান ব্যক্তি তাঁর হাতের ইশারায় আমাদেরকে ডাকছিলেন, এদিকে এসো, আমি তোমাদেরকে দরজার সন্ধান দিব। আর যদি আমাদের দিকে না আস, তাহলে তোমরা সারা জীবনেও বাগানের দরজা খুঁজে পাবে না। যখন আমরা তাঁর কাছে গেলাম, তখনই ঐ স্বপ্নের কথা আমার স্মরণ হলো যা বেশ কিছুকাল পূর্বে আমি অমৃতসরে দেখেছিলাম তা স্মরণ হল, আর আমি মনে মনে বলতে লাগলাম, (স্বপ্নের মধ্যেই স্বপ্নের কথা স্মরণ হল) আমি এই বুযূর্গকে এক সিংহাসনে মহানবী (সা.)-এর সাথেই স্বপ্নে দেখেছিলাম। দ্বিতীয় ব্যক্তি যাকে দেখেছিলাম, তিনি এই বুযূর্গই ছিলেন। তাই আমি জিজ্ঞেস করলাম, হুযূর আপনি কে? তখন তিনি বললেন, আমি ইবনে মরিয়ম। আর ঐ দেখ, এটিই বাগানের দরজা। যাও, দেখে আস। আমরা উভয়ই বাগানের ভেতর চলে গেলাম। আর প্রাণভরে ঘুরে দেখলাম। হঠাৎ আমার পিপাসা লাগল। আর আমি আমার সাথীকে বললাম, আমাদের পিপাসা লেগেছে। কিন্তু পানির ঝর্নাতো অনেক নিচে। হাত তো পৌঁছাবে না। কি করব? আমরা ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে একটি গাছের নীচে বসে পড়লাম। কিছুক্ষণ পরেই দশ-বার বছর বয়স্ক এক বালক একটি মহল থেকে বের হয়ে আসল। তার ডান হাতে ডিম্বাকৃতির একটি পেয়ালা ছিল আর এতে কোন জিনিস ছিল। সে এটা আমার হাতে দিল। আর বলল, তুমি এটা পান করে নাও। অতএব, আমার পিপাসা থাকার কারণে অর্ধেকের মতো অংশ আমি পান করে নিলাম। আর বাকীটা আমার সাথীকে দিলাম। ঐ বালকটি তার হাত থেকে পেয়ালাটি কেড়ে নিয়ে আমাকে দিল। আর বলল, এটা তোমার অংশ। এতে তার কোন অংশ নেই। অর্থাৎ, অপর ব্যক্তি যে স্বপ্নে তার সাথে ছিল, এতে তার কোন অংশ ছিল না। ফলে আমার সাথী লজ্জিত হয়ে বলতে লাগল, চল অনেক দেরী হয়ে গেছে। আমাদেরকে এখন অনেক দূর যেতে হবে। তাই আমরা অতি দ্রুত দরজার দিকে আসলাম। আমার সাথী খুব দ্রুত দরজার বাইরে চলে গেল। আর আমি তখনও ভেতরেই ছিলাম। তখন আমাদের মৌলভী সাহেবের ছেলে এসে আমাকে জাগিয়ে বলল, কি ব্যাপার! আপনি তাহাজ্জুদের পর কুরআন শরীফ না পড়ে আজ শুয়ে গেলেন যে? আমি তাকে রাগতস্বরে বললাম, আমি একটি ভাল স্বপ্ন দেখছিলাম। তুমি আমাকে জাগিয়ে খুবই মন্দ কাজ করেছ। সে আমাকে উত্তর দিল, খোদার বান্দা! ফজরের আযান হয়ে গেছে আর মৌলভী সাহেব মসজিদে জামাতের অপেক্ষায় রয়েছেন। চলুন, নামায পড়তে যাই। আমরা দু'জনই মসজিদে চলে গেলাম। আর ওযু করে মৌলভী সাহেবের সাথে বাজামাত নামায পড়লাম। নামায শেষ করার পর এই স্বপ্নের পুরো বিবরণ এবং যেভাবে খোদা তালার নিকট দোয়া করেছিলাম, আর যেভাবে খোদা তা'লা আমাকে স্বপ্নে সবকিছু দেখিয়েছেন, আমি সবকিছু মৌলভী সাহেবকে বললাম। আর এটিও বললাম, আমি হযরত মির্যা সাহেবকে আমার জীবনে পূর্বে কখনো দেখি নি আর কখনো কাদিয়ানেও যাই নি। এ স্বপ্নের ব্যাখ্যায় মৌলভী সাহেব বললেন, আপনি যে বাগান, শুকনো নদী এবং প্রাসাদ ইত্যাদি দেখেছেন; এর দ্বারা বুঝাচ্ছে, শরীয়তের বাগান। আর নদী হল, যুগের আলেমগণ, যারা

শুকিয়ে গেছে। তাদের কাছে এখন কোন জ্ঞান নেই। শরীয়তের মূল তাদের কাছে নেই। আর মহল এবং ঘর দ্বারা আমল বুঝানো হয়েছে, আর পেয়ালা দ্বারাও আমল বা কর্ম বুঝিয়েছেন, যার মধ্যে কিছুটা ত্রুটি রয়েছে। ডিম্বাকৃতি বলতে বুঝায় যে, এটি সোজা নয়। আর স্বপ্নে যে পূর্বদিকের ইংগিত রয়েছে তার অর্থ হলো, কাদিয়ান, আমাদের গ্রাম থেকে কাদিয়ান পূর্ব দিকেই অবস্থিত। এ ছাড়াও পূর্ব দিক সংক্রান্ত হাদীস বুঝে নাও। আর সেই বুর্যূগ অর্থাৎ, মসীহ্ পূর্বদিকেই আবির্ভূত হবেন। এটিও হাদীসের দিকেই ইঙ্গিত করছে। ইচ্ছা হয় বুঝে নাও। আর আপনি যে সম্মানিত ব্যক্তির চেহারার বিবরণ দিয়েছেন, তিনি হযরত মির্যা গোলাম আহমদ, মসীহ্ মওউদ এবং মাহদীয়ে মাসউদ, আর হাতের ইশারার অর্থ হলো, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের জামাতে অন্তর্ভূক্ত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত ইসলামী শরীয়ত ও বেহেশ্তের দরজার সন্ধান পাবে না। আপনি যে নিদর্শন যাচনা করেছেন, সে নিদর্শন খোদা তা'লা আপনাকে দেখিয়েছেন। এরপর তিনি বলেন, জুমুআর দিন আমি কাদিয়ান যাব, আপনিও আমার সাথে চলুন। যদি আপনার স্বপ্ন অনুযায়ী সে বুযূর্গ হযরত সাহেব হয় তবে মেনে নিবেন কোন জোর-জবরদস্তি নেই। মোটকথা, আমরা বৃহস্পতিবার কাদিয়ানের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলাম। আমরা যখন কাদিয়ান পৌঁছলাম তখন আমার প্রচন্ড জ্বর হল। মৌলভী সাহেব হযরত সাহেবের কাছে নিবেদন করলেন, আমাদের একটি ছেলে যে সত্যের সন্ধানে এখানে এসেছে তার জ্বর হয়েছে। হযরত সাহেব আমাকে দেখলেন এবং বললেন, মৌলভী সাহেব! আপনি তাকে রোযা রেখে সফরের কেন অনুমতি দিলেন? যদি পথিমধ্যে জ্বর বা অন্য কোন রোগে আক্রান্ত হতো তখন আপনি কী করতেন? এটি পবিত্র কুরআনের শিক্ষা বিরোধী। যাহোক, আমি ঔষধ পাঠিয়ে দিচ্ছি। ইনশাআল্লাহ্ ঠিক হয়ে যাবে। ঔষধ এসে গেল। সম্ভবত হামেদ আলী সাহেব ঔষধ নিয়ে এসেছিলেন, আমার ঠিক মনে নেই। আমি ঔষধ খেলাম এবং জ্বর একেবারেই ভাল হয়ে গেল। সে সময় আমি জ্বরে অচেতন থাকার কারণে হযরত সাহেবকে ভালভাবে চিনতে পারি নি। পরবর্তী দিন জুমুআ ছিল। আমি ওযু করে সামনে বসার জন্য দ্রুত মসজিদে গেলাম এবং প্রথম সারিতেই জায়গা পেয়ে গেলাম। প্রথমে মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব এবং এরপর মৌলভী সাহেব অর্থাৎ খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল সাহেব আসেন এবং তাঁদের পর হযরত মির্যা সাহেব আসেন আর আমি তাকে দেখা মাত্রই চিনতে পারি যে, ইনি-ই আমার স্বপ্নে দেখা ব্যক্তি এবং আমি মৌলভী সাহেবকে বললাম, এই লোকই ইবনে মরিয়ম! যাকে আমি দু'বার স্বপ্নে দেখেছি। তখন মৌলভী সাহেব নিশ্চিন্ত হলেন এবং ভাবলেন আজ এ নিজ থেকেই বয়আত করবে। যখন আমরা কাদিয়ান যাচ্ছিলাম তখন আমরা চারজন ছিলাম। আমি, দ্বিতীয় মৌলভী সাহেব, তৃতীয় সে যে স্বপ্নেও আমাদের সাথে ছিল আর চতুর্থত কুমার পেশার এক ব্যক্তি ছিলেন, যিনি বয়আতের উদ্দেশ্যে এসেছিলেন। মোটকথা, মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব খুতবা প্রদান করেন আর নামাযও তিনিই পড়ান। জুমুআর নামাযের পর ঘোষণা করা হল, যারা বয়আত করতে চান তারা সামনে এসে বয়আত করে নিন। যাহোক, সেদিন অনেকেই বয়আত করার জন্য অগ্রসর হল যাদের মাঝে আমাদের কুমার সাথীও ছিল। আমি যখন বয়আত করতে অগ্রসর হচ্ছিলাম তখন আমার সাথী যে স্বপ্নেও আমার সাথে ছিল আমার বয়আতে বাঁধা দিল আর কুমন্ত্রণা দিয়ে বলল, তুমি মির্যা সাহেবের বইগুলো পড়ছিলে তাই সেসব চিন্তাধারা স্বপ্নে মূর্ত হয়েছে— এছাড়া আর কিছু না। তোমার স্বপ্ন ভ্রান্ত। তিনি বলেন, সে এসবকিছু আমাকে বলে আর কুমন্ত্রণা সৃষ্টি করে বলে যে, সব ধোকা বৈ কিছু নয়; অপরদিকে আমিও মানসিকভাবে দুর্বল ছিলাম অর্থাৎ মানুষের কথায় গলে যেতাম। ফলে সে আমাকে বয়আত করা থেকে বিরত রাখল। পরবর্তী দিন সকাল সকাল আমরা চারজন কাদিয়ান থেকে নিজ গ্রামের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। যখন আমরা বাটালা থেকে আলী ওয়াল যাবার রাস্তায় অবস্থিত মুলে ওয়াল গ্রামের কাছাকছি পৌঁছলাম তখন মৌলভী সাহেব আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কী বয়আত করেছ? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, কেন কর নি? তোমার স্বপ্ন অনুযায়ী সবকিছু পূর্ণ হয়ে গেছে তবুও বয়আত কেন করো নি? আমি উত্তরে বললাম, ঐ ব্যক্তি আমাকে বাঁধা দিয়েছে আর বলেছে, তুমি মির্যা সাহেবের বই-পুস্তক পড় বলে সেই চিন্তাধারাই হুবহু তোমার স্বপ্নে মূর্ত হয়েছে আর কিছু নয়। এ কথা শোনা মাত্রই মৌলভী সাহেব আমার সাথে এবং ঐ ব্যক্তির সাথে যে তার চাচাত ভাই ছিল ভীষণ অসন্তুষ্ট হলেন আর আমাকে বলতে লাগলেন, যথেষ্ট হয়েছে এখন থেকে তোমার সাথে আমার ছাত্র-শিক্ষক বা আত্মীয়তার সম্পর্ক

ছিন্ন হলো। আমরা আসরের নামাযের সময় আমাদের গ্রামে পৌঁছলাম। এরপর আমি চার-পাঁচ দিন আমার গ্রামে অবস্থান করলাম কিন্তু মৌলভী সাহেব আমার সাথে অসন্তুষ্টই থাকলেন। ঘটনাক্রমে ভামড়ী গ্রাম থেকে আমার কাছে বাবুজান মুহাম্মদের চিঠি আসলো যে, আমি বদলি হয়ে হার চোয়াল নহরের বাংলোতে এসে গেছি আর আমার কাছে অনেক কাজ আছে। আমি শুনেছি, আপনি চাকরি ছেড়ে চলে এসেছেন। তাই পত্র পাওয়া মাত্রই ভামড়ী বা হার চোয়ালের বাংলোতে চলে আসবেন। যাহোক, আমারও মন উদাস ছিল। আমি পত্র পাওয়ার পরদিন কাদিয়ানের রাস্তায় হার চোয়ালের বাংলোতে পৌঁছে গেলাম। বাবু সাহেব আমাকে হাসি মুখে অভ্যর্থনা জানান ও আদর-যত্ন করেন। পরবর্তী দিন আমাকে কাজ দেয়া হল, আর আমি ব্যস্ত হয়ে গেলাম। তৃতীয় দিন আমি আবার তৃতীয় স্বপ্ন দেখলাম আর স্বপ্ন হলো, মির্যা সাহেব অর্থাৎ মসীহ্ মওউদ (আ.) আমার কাছে এসে বসলেন আর আমি সম্মান প্রদর্শনার্থে দাঁড়িয়ে গেলাম। গদ্দীনশীনদের রীতি অনুযায়ী তাঁর পায়ে চুমু দেবার জন্য মাথা অবনত করলাম কিন্তু হযরত সাহেব আমাকে তাঁর পবিত্র হাতে বাঁধা দিলেন এবং বললেন, এটি শির্ক। এরপর তিনি বললেন, দেখ মিয়াঁ ফযল উদ্দিন! তুমি খোদার কাছে দোয়ার মাধ্যমে নিদর্শন চেয়েছিলে, যদি আমাকে বাহ্যিকভাবে অথবা স্বপ্নে নিদর্শন দেখানো না হয় তবে কিয়ামতের দিন হে খোদা এ বান্দাকে তুমি বলতে পারবে না যে, তুমি মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে কেন মান্য করো নি। অতএব, এখন তুমি নিদর্শন লাভ করেছ আর তোমার সামনে সত্য স্পষ্ট হয়ে গেছে। এতটুকু বলেই তিনি চলে গেলেন আর আমি স্বপ্ন থেকে উঠে কাঁদতে শুরু করলাম আর এত কাঁদলাম যে, অশ্রুতে আমার বুক ভিজে গেল আর তখনি আমি বাবু সাহেবকে না বলে খালি পায়ে উঠে কাদিয়ানের উদ্দেশ্যে ছুটলাম (জুতাও পরেন নি)। এক ব্যক্তি আমাকে ছুটতে দেখে বাবু সাহেবকে গিয়ে বলল যে, মিস্ত্রি সাহেব নিজের গ্রামে পালিয়ে যাচ্ছেন। তখন বাবু সাহেব ঘোড়ায় চড়ে আমার পিছু পিছু এসে হার চোয়াল নদীর সেতুতে আমায় ধরে ফেলেন এবং বলেন, আপনার কী হয়েছে, আপনি অনুমতি না নিয়েই নিজ গ্রামে চলে যাচ্ছেন, সবকিছু ঠিক আছে তো? আমি বললাম, আমাকে যেতে দাও আমি গ্রামে যাচ্ছি না আমি কাদিয়ান যাচ্ছি। কাদিয়ানের নাম শোনার সাথে সাথে সে রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে যায় কেননা, সেও বিরোধী ছিল আর এখনও বিরোধী। মোটকথা, সে আমাকে কিছুতেই যেতে দিচ্ছিল না আর আমিও যাবার ইচ্ছায় অনড় ছিলাম। আমি বিনয়ের সাথে বললাম, বাবু সাহেব! আমাকে যেতে দিন নইলে আমি এখানেই জীবন দিয়ে দিব। কেননা, এটি আমার সাধ্যের ব্যাপার নয়। একটি শক্তিশালী অস্তিত্ব আমাকে জোরপূর্বক নিয়ে যাচ্ছে। আমি তিন দিন পর আপনার নিকট ফিরে আসার অঙ্গীকার করছি। যাহোক, সে আমাকে ছেড়ে দিল। আমি মনে মনে বলছিলাম, মির্যা সাহেব সত্য, কেননা আমার মনের কথা তিনি বলে দিয়েছেন যে, তোমার সামনে সত্য সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। অতএব, আমি কাদিয়ান পৌঁছলাম। এখন যেখানে লাইব্রেরী রয়েছে এর পিছনে কুপের পাশে একটি ছাপাখানা ছিল। সেই ছাপাখানায় মির্যা ইসমাঈল কাজ করতেন। আমি তাকে বললাম, মির্যা সাহেবের সাথে দেখা করতে চাই। তিনি বললেন, যোহরের নামাযের সময় তিনি মসজিদে মুবারকে যাবেন, আপনি সেখানে সাক্ষাৎ করে নিন। তিনি (আ.) সেদিন যোহরের নামাযে আসেন নি, মাগরীবের সময় এসেছেন। আমি তাঁর (আ.) সাথে সাক্ষাৎ করে নিবেদন করি, হুযুর! আমি বয়আত করতে চাই। হুযুর (আ.) বললেন, তিনদিন পর বয়আত নেয়া হবে। যাহোক, আমি সেখানে তিনদিন পর্যন্ত অবস্থান করি এবং তৃতীয় দিন আমি, ফারুক পত্রিকার সম্পাদক মীর কাশেম আলী সাহেব ও তৃতীয় আর একজন ছিলেন তার নাম আমার মনে নাই। খুব সম্ভব মৌলভী সারওয়ার শাহ্ সাহেব হবেন। আমরা তিনজন বয়আত গ্রহণ করে আহমদীয়া জামাতে দাখিল হই। এভাবেও আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে বয়আত করাতেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, **'আমাদের তবলীগের অনেক কাজ ফিরিশ্তারা সম্পন্ন করে থাকে'**।

আল্লাহ্ তা'লা এসব সাহাবীর পদমর্যাদা উত্তরোত্তর উন্নীত করুন আর তাঁদের বংশধরদের স্বীয় প্রবীণ ও বর্ষীয়ানদের পুণ্যকর্ম সমূহ অবলম্বন করার তৌফিক দিন।

আমি এখন একজন শহীদের স্মৃতিচারণ করতে চাই এবং জুমুআর নামাযের পর তাঁর গায়েবানা জানাযাও পড়াবো, ইনশাআল্লাহ্। তিনি হচ্ছেন মোকাররম চৌধুরী মঞ্জুর আহমদ গোন্দল সাহেবের ছেলে মোকাররম মোহতরম চৌধুরী নুসরত মাহমুদ সাহেব। তার পারিবারিক পরিচয় হলো, হযরত চৌধুরী এনায়েত

উল্লাহ্ সাহেব (রা.)-এর মাধ্যমে তাঁদের বংশে আহমদীয়াতের সূচনা হয়; যিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী ছিলেন। শহীদ মরহুমের দাদা জনাব চৌধুরী ইখলাস আহমদ সাহেবের কাযিন ছিলেন। পরবর্তীতে তার প্রচেষ্টায় প্রথম খিলাফতের সময় চৌধুরী ইখলাস আহমদ সাহেবও বয়আত করেন। তার পূর্ব পুরুষগণ শিয়ালকোর্ট জেলার বাহওয়ালপুরের অধিবাসী ছিলেন। দীর্ঘ দিন অর্থাৎ প্রায় ৩০বছর চৌধুরী নুসরত সাহেব মন্ডী বাহাউদ্দীনে বসবাস করেন। ২০০৮ সালে স্ত্রী ও ছোট মেয়েসহ আমেরিকার নিউইয়র্কস্থ লং আইল্যান্ডে স্থানান্তরিত হন এবং সেখানকার নাগরিকত্ব লাভ করেন। নুসরত মাহমুদ সাহেব ৬ই মার্চ ১৯৪৯ সালে শিয়ালকোট জেলার বাহওয়ালপুরে জন্মগ্রহণ করেন। এরপর শিয়ালকোটের 'মারে' কলেজ থেকে ডিগ্রী করেন। অতঃপর মন্ডি বাহাউদ্দীনের শাহ্ তাজ সুগার মিলে চাকরী করেন। তিনি সেখানে প্রায় ৩৫ব ছর ম্যানেজার হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। যেমনটি আমি বলেছি, এরপর তিনি আমেরিকায় চলে যান। তিনি গত সেপ্টেম্বরে তার ছোট মেয়ে শায়েযাহ্ মাহমুদ সাহেবার বিয়ে উপলক্ষে আমেরিকা থেকে পাকিস্তানে আসেন। শহীদ সা'দ ফারুক সাহেবের সাথে ৫ই অক্টোবর ২০১২ সালে শায়েযাহ্ মাহমুদ সাহেবার বিবাহ সম্পন্ন হয়, যাকে বিয়ের তৃতীয় দিনই শহীদ করা হয়েছিল। তিনি ফারুক আহমদ কাহলুন সাহেবের ছেলে ছিলেন। আমি ১৯শে অক্টোবর জুমুআর দিন জানাযা উপলক্ষে সা'দ ফারুকের কথা উল্লেখ করেছি। শহীদ সা'দ ফারুক সাহেব এবং তার বেয়াই ফারুক আহমদ কাহলুন সাহেব ও পরিবারের আরো কয়েকজন পৌরসভাস্থ বায়তুল হামদ মসজিদ থেকে জুমুআর নামাযের পরে বাড়ী ফিরছিলেন তখন অজ্ঞাত পরিচয় দুষ্কৃতকারীরা তাদেরকে লক্ষ্য করে গুলি করে। সা'দ ফারুক সাহেব ঘটনাস্থলেই শহীদ হয়ে যান। দু'তিন সপ্তাহ পূর্বে তার জানাযা পড়ানো হয়েছে। বাকীরা আহত হন। চৌধুরী নুসরত মাহমুদ সাহেবের ঘাড়ে একটি গুলি লাগে এবং দু'টি গুলি তাঁর বুকে বিদ্ধ হয়। দ্রুত তাকে হাসপাতালে নেয়া হয়। তাকে প্রথমে শহীদ আব্বাসী হাসপাতাল এবং পরে আগা খাঁন হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। প্রায় ২৮দিন চিকিৎসাধীন ছিলেন। আরোগ্য লাভ সম্ভব হয় নি বরং কয়েকটি ক্ষত দ্রুত অবনতির দিকে যায় যে কারণে গত ২৭ নভেম্বর মঙ্গলবার রাত ১১টায় তিনি প্রিয় প্রভুর নিকট ফিরে যান এবং শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ । আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় শহীদ মরহুম মূসী ছিলেন এবং ধর্মসেবার প্রেরণায় ছিলেন সমৃদ্ধ। মন্ডি বাহাউদ্দীনে বসবাসের সময় তিনি সেক্রেটারী রিশ্তানাতা ও সেক্রেটারী তবলীগ হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি বিভিন্ন পদে থেকে জামাতের কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন। ২০০৮ সালে আমেরিকা স্থানান্তরিত হবার পর নিউইয়র্কের লংআইল্যান্ডে, তিনি সেক্রেটারী তরবীয়ত হিসাবে খিদমত করছিলেন। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান এবং ঈমানদার মানুষ ছিলেন। যেখানে কাজ করতেন সেখানে একবার সততার জন্য পুরষ্কারও লাভ করেছিলেন। খিলাফতের সাথে তাঁর গভীর সম্পর্ক ছিল। সকল তাহরীকে তিনি গভীর উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে অংশগ্রহণ করতেন। তবলীগের কাজে নিজে উপস্থিত হতে না পারলে অন্যদের যাবার জন্য নিজের গাড়ী দিয়ে দিতেন যেন পুণ্যকর্মে অংশীদার হতে পারেন। তার ছেলে কাশেফ আহমদ দানেশ পিতা সম্পর্কে লিখেন, আমি আমার পিতাকে অত্যন্ত স্নেহশীল ও সন্তান বাৎসল্যে পূর্ণ পেয়েছি। শৈশব থেকে যৌবন পর্যন্ত সর্বদাই তিনি সন্তানদের ব্যাপারে খুবই যত্নবান ছিলেন। তাদের সুশিক্ষিত ও উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী করার জন্য সর্বদা চেষ্টা করতেন। তিনি উন্নত চরিত্র ও নম্রভাষী মানুষ ছিলেন। তিনি সন্তানদের কখনও তুমি বলে ডাকেন নি বরং আপনি বলে সম্বোধন করতেন। তার ছেলে বলেন, তিনি আমার জামাতী কাজের প্রতি আগ্রহ দেখলে সব সময় আমার কাজের প্রশংসা করতেন। আহমদীয়া খিলাফতের সাথে সম্পর্ক দৃঢ় করার জন্য সর্বদা নসীহত করতেন। বাড়ি ফিরে সর্বপ্রথম সন্তানদের নামাযের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতেন। কোন কারণে কেউ নামায না পড়ে থাকলে, তিনি তৎক্ষণাৎ নামায পড়তে বলতেন। আমি যখন ছোট ছিলাম, তিনি আমাকে বাজামাত নামায পড়ার জন্য সাথে নিয়ে যেতেন। কাজের মাঝে বা সফরে যেখানেই থাকতেন না কেন নামাযের বিশেষ ব্যবস্থা করতেন। কারো সাথে রূঢ়ভাবে কথা বলেন নি। সর্বদাই নৈতিক গুণাবলীতে সজ্জিত হওয়ার কথা বলতেন। তার নম্র-কথন এবং মিশুক স্বভাবের কারণে অল্প সময়ই মানুষ তার প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হতো। তার সম্মানিতা স্ত্রী বর্তমানে আমেরিকায় আছেন। তিনি সসম্প্রতি এখানে এসেছিলেন। কিন্তু অসুস্থতার কারণে চলে যান, তিনিও সেখানে চিকিৎসাধীন আছেন।

তার জন্য দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা তাকেও আরোগ্য দান করুন। তার ছেলে কাশেফ আহমদ দানেশ কানাডায় থাকেন এবং সেখানকার খোদ্দামুল আহমদীয়া কানাডার নায়েব সদর হিসাবে কাজ করার সুযোগ পাচ্ছেন। মরহুমের তিনজন কন্যা সন্তান রয়েছে। সর্ব কনিষ্ঠ কন্যা শহীদ সা'দ ফারুকের বিধবা স্ত্রী। মুহাম্মদ মুনীর শামস সাহেব মুরব্বী হিসেবে মন্ডি বাহাউদ্দীনে প্রায় ১১ বছর কাজ করেছেন। তিনি বলেন, জেলা মুরব্বী হিসেবে তাঁর সাথে ১১ বছর কাজ করার সুযোগ হয়েছে। তিনি সুগার মিলের বিভাগীয় প্রধান ছিলেন। তিনি সেখানকার আনসারুল্লাহ্র যয়ীম, সেক্রেটারী রিশ্তানাতা, মসজিদ, অতিথিশালা ও মুরব্বী কোয়ার্টার কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন, তিনি পাঁচ বেলার নামায বাজামাত পড়তেন। বাড়িতে খাবার খেয়ে অফিসে যেতেন। যোহরের নামাযের সময়ও তিনি অফিস থেকে প্রথমে নামাযে যেতেন এরপর আবার অফিসে যেতেন। মসজিদের পাশেই মুরব্বী কোয়ার্টার ছিল। মুরব্বী সাহেব বলেন, যখনই কোনদিন নিভৃতে কিছুটা ইবাদত করার অর্থাৎ মসজিদে গিয়ে ফজরের পূর্বে নফল পড়ার পরিকল্পনা ও চেষ্টা করতাম সর্বদা নুসরত মাহমুদ সাহেবকে মসজিদে উপস্থিত দেখতাম। যখনই গিয়েছে তাঁকে আল্লাহ্ তা'লার দরবারের অঝোরে কেঁদে কেঁদে দোয়ারত দেখতে পেয়েছি। তিনি আয় অনুযায়ী সঠিক বাজেট লিখাতেন এবং সঠিক সময় চাঁদাও পরিশোধ করে দিতেন। সদকা প্রদান ও পুণ্যকর্মে উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে অংশ নিতেন। তিনি পরিচ্ছন্নতা-প্রিয় মানুষ ছিলেন। তিনি নিজের পরিচ্ছন্নতার খেয়াল রাখতেন সেই সাথে গেষ্ট হাউস ইত্যাদির পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতারও খেয়াল রাখতেন। মুরব্বী সাহেব বলেন, আমার সাথে প্রাতঃভ্রমনে গেলে তিনি পথে জাগতিক কোন আলোচনা বা কথা বলতেন না। সবসময় তবলীগ এবং জামাতী বিষয়ে কথা বলতেন। নিজের গাড়ীতে পেট্রোল ভরে জামাতী কাজে বা গরীব ছেলে মেয়েদের জন্য দিয়ে দিতেন। যাতায়াতের পথে কোন গরীবকে লিফট দেয়ার প্রয়োজন হলে তাও করতেন। তিনি বলেন, আমি তাঁকে কখনও রাগান্বিত হতে দেখিনি।

তাঁর এক অ-আহমদী কর্মচারী বলেন, আমি পঁচিশ বছর ধরে নুসরত সাহেবর সাথে কাজ করছি, তিনি কখনও আমাকে ধমক দেন নি এবং কখনও অসন্তোষ প্রকাশ করেন নি। সব কর্মচারীকে প্রতি ঈদে অবশ্যই নতুন কাপড় ও ঈদের উপহার দিতেন। খিলাফতের সাথে গভীর ও আন্তরিক সম্পর্ক ছিল। খুতবা সবসময় প্রথম সম্প্রচারের সময় শুনতেন এবং সফরে খুতবায় বর্ণীত বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন এবং বিষয়বস্তু বর্ণনা করতেন। তিনি সর্বদাই ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দেয়ার নসিহত করতেন। মুরব্বী সাহেব বলেন, কোথাও যাবার থাকলে তিনি প্রথমে মুরব্বী সাহেব ও তার পরিবারকে নিজের গাড়ীতে করে পৌঁছে দিতেন এরপর এসে নিজের পরিবারকে নিয়ে যেতেন। ভোজসভায় অবশ্যই গরীবদেরও নিমন্ত্রণ জানাতেন। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর পদমর্যাদা উন্নীত করুন এবং তাঁর সন্তান সন্ততিদেরও পিতার পুণ্যকর্মকে ধরে রাখার তৌফীক দান করুন।

আল্লাহ্ তা'লা পাকিস্তানের প্রত্যেক আহমদীকে আহমদীয়াতের শত্রুদের সকল অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন এবং নিজ অপার কৃপায় অচিরেই তাদের বিজয় ও আপন সাহায্যে ধন্য করুন। যেমনটি আমি বলেছি, এ দিনগুলোতে দোয়ার প্রতি খুব বেশি জোর দিন।

(জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ ও বাংলা ডেস্কের যৌথ প্রচেষ্টায় অনুদিত)